‘উলঙ্গ রাজা’ : বন্ধুর পিঠে হাত

অংশুমান কর

‘উলঙ্গ রাজা’ প্রথম প্রকাশ পায় ১৯৭১ -এর জুলাই মাসে। এই রচনার প্রয়োজনে উলঙ্গ রাজা-র যে সংস্করণটি আমি ব্যবহার করেছি, সেটি এই কৃশতনু গ্রন্থটির সপ্তদশ মুদ্রণ। প্রকাশ পেয়েছে ২০০৭ -এ। একটি কবিতা গ্রন্থ, গ্রন্থটির রচয়িতা কবির শ্রেষ্ঠ কবিতা, কবিতা সমগ্র প্রকাশ পেয়ে যাওয়ার পরেও, মুদ্রিত হচ্ছে, সতেরোতম বার মুদ্রিত হচ্ছে— ভাবলে আশ্চর্য লাগে! স্বাধীনতা-উত্তর বাংলা কবিতায় যে কটি কবিতাগ্রন্থ কেবলমাত্র কবিতার বই হয়ে পাঠকের হৃদয়ে জায়গা করে নেয়নি, আদায় করে নিয়েচে মিথের মর্যাদা, উলঙ্গ রাজা সেই স্বল্প কটি কবিতাগ্রন্থের একটি। এই কবিতাগ্রন্থটির এই বিপুল জনপ্রিয়তার কারণ কী? একটি কারণ তো অবশ্যই গ্রন্থটির শিরোনাম কবিতাটির পাহাড় প্রমাণ জনপ্রিয়তা ও প্রভাব। কবিতাটি এতখানিই জনপ্রিয় হয়েছে যে সিলেবাস প্রণেতারাও তাঁদের স্বভাবসিদ্ধ ঔদ্ধত্য ও কূপমন্ডুকতা নিয়ে কবিতাটির প্রতি উদাসীন থাকতে পারেননি। অবশ্য কেবল একটিমাত্র কবিতা একটি কবিতাগ্রন্থকে জনপ্রিয় করে তুলতে পারে না। উলঙ্গ রাজা কাব্যগ্রন্থে আছে এমন একাধিক কবিতা, যেগুলি হয়তো গ্রন্থটির নাম কবিতাটির মতো অতখানি জনপ্রিয় নয়, কিন্তু পাঠকের আদর বঞ্চিতও নয়। বলে রাখা ভালো ‘জনপ্রিয়তা’ এই শব্দটিকে এই রচনায় নেতিবাচকতার ধূসর মোড়কে বন্দি করে রাখা হচ্ছে না। ভুলে যাওয়া হচ্ছে না যে জনপ্রিয় সাহিত্য এবং উত্তম সাহিত্যের মধ্যে সম্পর্কটি কেবলই বৈরিতার নয়। একথা তাই নির্দ্বিধায় বলা যায় যে বাংলা সাহিত্যের অনেকগুলি শ্রেষ্ঠ কবিতার সংকলন উলঙ্গ রাজা। এই গ্রন্থটির জনপ্রিয়তা এর শ্রেষ্ঠত্বেরই পরিচায়ক।

‘উলঙ্গ রাজা’ গ্রন্থটিকে, বা আরও একটু স্পষ্ট করে বললে, নীরন্দ্রেনাথ চক্রবর্তীকেই পাঠক এভাবে মহাসমারোহে বরণ করে নিয়েছে কেন? একটা কারণ তো অবশ্যই এই যে প্রথম থেকে নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী যে ভাষায় কবিতা রচনা করেছেন সে ভাষা মানুষের মুখের ভাষার কাছাকাছি। নীরেন্দ্রনাথ পাঠকের সঙ্গে কথা বলেছেন সরাসরি। আড়াল থেকে নয়। কবিতায় কাহিনি থাকলে সে কবিতার সঙ্গে পাঠকের সম্পর্ক স্থাপন সহজ হয়, আর প্রথম থেকেই কাহিনিকে অত্যন্ত মুন্সিয়ানার সঙ্গে কবিতা করে তুলেছেন নীরেন্দ্রনাথ। সামগ্রিকভাবে নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী কবিতার জনপ্রিয়তার মূল যে এই দুটি কারণ সেই কারণ দুটি অবশ্যই উলঙ্গ রাজা-র জনপ্রিয়তা নির্ধারণে অনিবার্য ভূমিকা নিয়েছে। কিন্তু, একথা মনে করার কোনো কারণ নেই যে উলঙ্গ রাজা কেবলমাত্র সাধারণ মানুষের মুখের ভাষায় রচিত কাহিনি-নির্ভর কবিতারই একটি সংকলন। এই ধরনের কবিতা উলঙ্গ রাজা-তে আছে। আছে অন্য ধরনের কবিতাও। তেমনই একটি অন্য ধরনের কবিতা ‘স্বপ্নে-দেখা ঘরদুয়ার’ :

পুকুর, মরাই, সবজি-বাগান, জংলা ডুরে শারি,
তার মানেই তো বাড়ি।
তার মানেই তো প্রাণের মধ্যে প্রাণ,
নিকিয়ে-নেওয়া উঠোনখানি রোদ্দুরে টান্-টান্।
ধান খুঁটে খায় চারটে চড়ুই, দোলমঞ্চের পাশে
পায়রাগুলো ঘুরে বেড়ায় ঘাসে।
বেড়ালটা আড়মোড়া ভাঙছে; কুকুরটা কান খাড়া
করে শুনছে কথা বলছে কারা।
পূবের সূর্য পশ্চিমে দেয় পাড়ি,
দুপুরবেলার ঘুমের থেকে জেগে উঠছে বাড়ি।

লাঠির ডগায় পুঁটলি বাঁধা, অনেকটা পথ ঘুরে
লোকটা যাচ্ছে দূরের থেকে দূরে।
ওর চোখেও কি এমনি একটা বাড়ির স্বপ্ন টানা?
ওর মনেও কি গন্ধ ছড়ায় গোপন হাস্নুহানা?
ও বড় বউ, ডাকো, ওকে ডাকো,
ওই যে লোকটা পার হয়ে যায় কাঁসাই নদীর সাঁকো।

এই কবিতাটির প্রেমে আজীবন আমি এমনই মগ্ন যে পুরো কবিতাটিই উদ্ধৃত করার লোভ সামলাতে পারলাম না। তার্কিকেরা বলতে পারেন যে এই কবিতাটিতেও কি গল্প নেই, অন্তত শেষ দুই পংক্তিতে গল্পের আভাস? আছে। কিন্তু সেই আভাস অতিক্রম করে এই কবিতায় যা প্রধান হয়ে ওঠে, তা হল ছবি। গৃহস্থালীর ছবি। এত নিপুণভাবে সে ছবি আঁকা যে মনে হতেই পারে যে চিত্র-অঙ্কনে কখনও কখনও কলম বোধহয় তুলির চেয়েও বেশি শক্তিশালী। ‘স্বপ্নে-দেখা ঘরদুয়ার’ ব্যতিক্রম নয়। উলঙ্গ রাজা-তো আছে এরকম একাধিক কবিতা, যে কবিতাগুলি সবসময় সবধরনের পাঠকের কাছে গ্রহণযোগ্য হয়ে ওঠে। কিন্তু, কাহিনি আর মুখের ভাষার ব্যবহারের মতোই কবিতায় চিত্রাঙ্কনের দক্ষতাকেও আমি উলঙ্গ রাজা-র জনপ্রিয়তার মূল কারণ হিসেবে চিহ্নিত করব না। উলঙ্গ রাজা-র জনপ্রিয়তার মূল কারণটি অন্যত্র নিহিত।

উলঙ্গ রাজা-র ব্লার্বে লেখা হয়েছিল : ‘‘নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর কবিতা পড়লেই বোঝা যায়, তিনি এই রুগ্‌ণ সমাজের ব্যাখ্যাতা, এই দুঃস্থ দিবসের ভাষ্যকার। তাঁর কবিতা যেন সন্ধানী আলোর মত; দেশ ও কালের নানা গোপন যন্ত্রণাকে যা নিমেষে উদ্‌ঘাটিত করে। সর্বকালের যোগ সম্পর্কে আস্থাশীল হয়েও তিনি সমকালের সঙ্গী, ঐতিহ্যের সঙ্গে যুক্ত থেকেও তিনি প্রতি মুহূর্তেই আরও নূতন কলেবরে দীপ্তিমান।’’ ভুল লেখা হয়নি। উলঙ্গ রাজা ভীষণভাবেই ছিল সময়ের ফসল। ব্লার্ব

থেকেই ২০১১-তেও পাঠক জেনে যান যে 'কলঘরে চিলের কান্না', 'অকাল-সন্ধ্যা', 'জোড়া খুন', 'কবিতা-৭০', 'হ্যালো দমদম', 'গোলাপ যাত্রা' ইত্যাদি প্রায় মিথ হয়ে যাওয়া কবিতাগুলি লেখা হয়েছিল গ্রন্থটি প্রকাশের 'কয়েক মাস' আগে। বাস্তবিকই, কবিতার নীচে লিপিবদ্ধ তারিখে চোখ রাখলে দেখা যায় উলঙ্গ রাজা-র কবিতাগুলি রচিত হয়েছিল বাংলা ১৩৭৬-৭৭ অর্থাৎ ইংরেজি ১৯৬৯ ৭০ সালে। দুই বাংলাই সেইসময় উত্তাল। রক্তপাতে, প্রাণক্ষয়ে। গ্রন্থটির প্রথম কবিতাতেই তাই নীরেন্দ্রনাথ লিখেছিলেন, 'ফিরাবে বিমল চক্ষু, কোন্ দিকে ফিরাবে?/ কার হাতে রক্ত নেই?' কঠিন সেই সময়ে দাঁড়িয়ে পাঠকের সঙ্গে কথা বলছিলেন নীরেন্দ্রনাথ। কীভাবে? নিজের মতো করে, এমন একটি পদ্ধতিতে, এমন এক ভঙ্গিতে যা একান্তভাবেই নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর নিজস্ব।

সময়ের সঙ্গে সরাসরি সংঘর্ষে যে কবিতা জন্ম নেয়, একটি দুটি ব্যতিক্রম বাদ দিলে সে কবিতায় সাধারণত কবি পাঠকের সঙ্গে কথা বলেন সরাসরি, স্পষ্ট স্বরে। অবশ্য এই কথা বলার ভঙ্গিটি সবসময় একই রকম হয় না। কোনো কবির কণ্ঠে থাকে রাগ, কেউ স্মার্ট, কেউ বা আবার ধ্যানী প্রাজ্ঞের মতো সময় ও সভ্যতার সম্পর্কের বিষয়ে যেন শেষ কথাটি বলে দেন তাঁর কবিতায়। বলাবাহুল্য কীভাবে কবি কথা বলবেন পাঠকের সঙ্গে তা অনেকটাই নির্ণীত হয় কবির সামাজিক/ রাজনৈতিক অবস্থানের দ্বারাও। যে উত্তাল সময়ে উলঙ্গ রাজা রচিত, সেই উত্তাল সময়ে আগে/ পরে রচিত বেশ কিছু কবিতায় তাই দেখা গেছে রাগ, যন্ত্রণার স্পষ্ট প্রকাশ। এই ধরনের কবিতা লিখেছেন তাঁরা, যাঁরা ছিলেন নিজেরাই কেবল কবি নন, রাজনৈতিক কর্মী, নিদেনপক্ষে ইংরেজিতে যাঁদের বলে 'অ্যাক্টিভিস্ট', সেই 'অ্যাক্টিভিস্ট'। আর যাঁরা সেই সময়টাকে মাপছিলেন একটা দূর থেকে, তাঁদের কবিতায় প্রায়ই জায়গা করে নিচ্ছিল ধ্যানীর প্রজ্ঞা, তাঁরা করছিলেন সময়ের বিচার। এই দুটি পথের কোনোটিই নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর পথ ছিল না।

উলঙ্গ রাজা-র নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী ভীষণভাবেই শিক্ষিত, মধ্যবিত্ত বাঙালির কবি। এই বাঙালির হয়ে তিনি কথা বলেন; এই বাঙালির সঙ্গে তিনি কথা বলেন। যেকোনো শিক্ষিত মধ্যবিত্ত বাঙালি মাত্রই কিন্তু এই বাঙালি নন। এই বাঙালি বরং শিক্ষিত মধ্যবিত্ত বাঙালির একটি অংশ। এই বাঙালির বিপ্লবের জন্য আত্মবলি দিতে প্রস্তুত মুষ্টিমেয় 'অ-সাধারণ' বাঙালি নয়, বিপ্লবের স্পন্দন বুকে লালন করে বিপ্লবের আঁচ বাঁচানোর চেষ্টা করা 'সাধারণ' বাঙালি। এই বাঙালি একটু আধটু অন্যায় করলেও সামগ্রিকভাবে অন্যায়কে ঘৃণা করে। অন্যায়ের প্রতিবাদ করতে এই বাঙালি ভয় পায়, ভাবে অন্য কেউ প্রতিবাদ করবে তার হয়ে। অপমানের মুখে এই বাঙালি গর্জে উঠে না। ভুলেও যায় না অপমান। মনে রাখে। মনে রেখে অপেক্ষায় থাকে। এই অপেক্ষা বিপ্লবের অপেক্ষা নয়, সুযোগের। একটি সিদ্ধান্ত নেওয়ার। এই বাঙালির কবিতা। এই কবিতায় যে 'আমি' ভিড়ের ভেতরে 'সত্যবাদী, সরল, সাহসী' শিশুটিকে খুঁজে বেড়ায়, সেই 'আমি' টি আসলে কে? কবি? নিশ্চয়। কিন্তু এই 'আমি' কেবলই কবি নন। এই 'আমি' আসলে একজন প্রতিনিধি, প্রতিনিধি সেই সমস্ত শিক্ষিত মধ্যবিত্ত বাঙালির, যারা অন্তর থেকে উমেদারি- কে ঘৃণা করলেও রাজার মুখের সামনে সরল সত্য উচ্চারণ করতে পারে না; মরমে মরে যেতে যেতে এই বাঙালি চায় কেউ একজন রাজার মুখের সামনে সরল সত্যটি উচ্চারণ করুক। তাই 'সত্যবাদী, সরল, সাহসী' শিশুটিকে এই বাঙালিরা সারাক্ষণ খুঁজতে থাকে। উলঙ্গ রাজা, আসলে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত বাঙালির এই এই অন্বেষণের কবিতা।

এই শিক্ষিত মধ্যবিত্ত বাঙালি যেমন প্রতিবাদ করতে ভয় পায়, কিন্তু চায় প্রতিবাদ হোক, তেমনই খুব উঁচুতে এই বাঙালি পৌঁছতে পারে না ঠিক, কিন্তু উঁচুতে যাঁরা পৌঁছোয় তাঁদের কদর করতে জানে। শীর্ষ এই বাঙালির নাগালের বাইরে আর সেজন্যই হয়তো এই বাঙালি শীর্ষের মহিমা বোঝে। কিছুতেই মেনে নিতে পারে না মাপে ছোটো মানুষের হাতে মাপে বড়ো-র লাঞ্ছনা। 'এক আকাশে থেকে অন্য আকাশের দিকে/ তেজস্বী ও স্বভাবত-সঙ্গিহীন সম্রাটের মতো/ সহজ উল্লাসে' বাতাসে সাঁতার কেটে চলা গগনবিহারী চিনল যখন 'কলঘরের অন্ধকারে বন্দী' থাকে তখন এই বাঙালি-ই আসলে লেখে:

গগনবিহারী চিল,
সকালে তোমাকে আমি মুক্তি দেব বলে
দরজা খুলে যখন দেখলুন,
মেঝের উপরে তুমি স্থির ও নিঃশব্দ হয়ে পড়ে আছ,
তখন আবার মনে হয়েছিল
তুমি পাখি নও, তুমি অফুরন্ত আকাশের প্রাণমূর্তি, যেন
সমস্ত আকাশ আজ
নিতান্ত ছাপোষা এক গৃহস্থের
কলঘরের ক্লিন্ন অন্ধকারে
মরে পড়ে আছে। ('কলঘরে চিলের কান্না')

শীর্ষের লাঞ্ছনা যেমন এই বাঙালি মেনে নিতে পারে না, তেমনই মেনে নিতে পারে না অসম লড়াইয়ে দুর্বলের পরাজয়। শেষবেলায় ক্ষুধার্ত বোলারদের সামনে যখন দলের প্রথম সারির ব্যাটসম্যানদের বাঁচাতে ব্যাট হাতে এসে দাঁড়ায় এগারো নম্বর খেলোয়াড়, তখন এই বাঙালিই বলে :

তুমি যাও।
তুমি গিয়ে ওদের তেষ্টা মেটাও।
তুমি আমার এগারো-নম্বর খেলোয়াড়;
কিন্তু প্রোমোশন দিয়ে তোমাকে আমি
তিন-নম্বরে তুলে আনলুম।

তোমার স্বার্থে নয়,
দলের স্বার্থে।

বাছা, তুমি ধরেই নাও যে, এই পড়ন্ত বেলায়
দলের স্বার্থে তোমাকে আমরা
খুন হতে পাঠাচ্ছি। ('রক্তপাত, পড়ন্তবেলায়')

কেবল 'কলঘরে চিলের কান্না' বা 'রক্তপাত, পড়ন্তবেলায়' -এর মতো কবিতাতেই নয়, উলঙ্গ রাজা-র আরও একাধিক কবিতাতেই নীরেন্দ্রনাথের কণ্ঠ হয়ে ওঠে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত বাঙালির একটি অংশের কণ্ঠ। যে কথা নীরেন্দ্রনাথ বলেন, এই বাঙালির মনে হয়, সেকথা তাদেরই কথা। জানি না বাংলা কবিতার পাঠকের শ্রেণী চরিত্র নির্ধারণের কোনো সমীক্ষা করা হয়েছে কিনা। হয়ে থাকলে বা আগামীতে হলে, হয়তো বোঝা যাবে যে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত বাঙালির যে অংশের কণ্ঠস্বর হয়ে ওঠেন নীরেন্দ্রনাথ, বাংলা কবিতার মূল পাঠক তারাই।

এই পাঠকের হয়ে যে নীরেন্দ্রনাথে সবসময় কথা বলেন তা নয়। প্রায়ই নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী কথা বলেন এই পাঠকের সঙ্গেও। তিনি তাদের বলেন:

চলো, বেরিয়ে পড়ি।
আকাশ এখন ক্রমেই আরও রেগে যাচ্ছে।
যাক্।
ভয় করলেই ভয়, নইলে কিছু না।
রাস্তাময়
ইঁটের টুকরো, বোতল-ভাঙা কাচের গুঁড়ো
ছড়িয়ে আছে। থাক্।
যার যা ইচ্ছে করুক।
ভয় করলেই ভয়, নইলে কিছু না। ('ভয় করলেই ভয়')

শিক্ষিত মধ্যবিত্ত বাঙালির হয়ে যখন নীরেন্দ্রনাথ কথা বলেন তখন সেই কথা বলার অতলে ফল্গুর মতো আশা তার স্বপ্নের নদী বয়ে চললেও, সেই নদীকে প্রায় ঢেকে দেয় শঙ্কার পলি আর সঙ্কোচের প্রস্তর। এই বাঙালির সঙ্গে যখন নীরেন্দ্রনাথ কথা বলেন তখন এই শঙ্কা তার সঙ্কোচের ঝুঁটি ধরে নাড়া দেন তিনি। কিন্তু কেন? তিনি কি চান এই বাঙালি শঙ্কা-সঙ্কোচ ঝেড়ে ফেলে পাল্টে দিক এই সমাজ, দাঁড়াক মিছিলের প্রথমে? না, অতখানি দাবি নীরেন্দ্রনাথের নেই। তবে অপমানের মুখে গর্জে না উঠলেও এই বাঙালি অপমানকে যে হজম করে ফেলে না তা নীরেন্দ্রনাথ জানেন। জানেন যত আঘাত আসে বাহিরে ততই, যেন গোপনে গোপনে, শক্ত হয়ে ওঠে ভিতর, অন্দরমহল:

তুমি যত বাহিরে আঘাত হানো,
ভিতের-ভিতরে
আমার প্রতিজ্ঞা তত জোর পায়।
প্রকাশ্য সভায়
তুমি যত
হাততালি-জমানো ব্যঙ্গ ছুঁড়ে দিয়ে চলে যাও,
ততই আমার
শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস বেড়ে যায়
নিজের উপরে।

আসল কথাটা এই, দরকারমতন আমি
ফিরে আসতে পারি, ফিরে আসি
নিজের নিতান্ত কাছে,
একান্ত নিজস্ব এই ঘরে। ('ভিতর-মহল')

এই যে নিজের কাছে ফিরে আসতে পারা বাঙালি, সেই বাঙালি, নীরেন্দ্রনাথ জানেন, স্পষ্ট বাক শিশুর মতো সরল সত্য হয়তো উচ্চারণ করতে পারে না, কিন্তু, অন্তত, ঘুরে দাঁড়াতে জানে। নীরেন্দ্রনাথ চান তারা ঘুরে দাঁড়াক। জিহ্বায় যে ভাষা জায়গা পায়নি, সে ভাষা জায়গা পাক শরীরে:

কাউকে একবার ঘুরে দাঁড়াতে দেখলেই ওরা পালায়।
ওদের মারমুখো ওই ভঙ্গিটা তো আর কিছু নয়,
লোক-দেখানো, লোক-ঠকানো
ছলা।
চলো বেরিয়ে পড়ি।
ভয় করলেই ভয়, নইলে দেখো,
কিচ্ছু না, কাঁচকলা। ('ভয় করলেই ভয়')

নিজের কাছে ফিরে আসতে পারা এই বাঙালিকে ঘুরে দাঁড়ানোর সাহসটুকু যোগায় উলঙ্গ রাজা। যোগান নীরেন্দ্রনাথ:

আমি তোমার হয়ে অস্ত্রধারণ করতে আসিনি।
আমি তোমাকে সাহস দিতে এসেছি।
আমি তোমাকে বলতে এসেছি:
আলো ফুটবার এই আগের মুহূর্তেই
সব চাইতে অন্ধকার। ('যার জন্যে, তার জন্যে')

মনে হতে পারে এই যে অস্ত্রধারণের কথা চলে এল এই কবিতায়, তাহলে কি নীরেন্দ্রনাথ চাইছেন সত্যিই অস্ত্র উঠে আসুক তাঁর পাঠকের হাতে? না। অস্ত্র একবার হাতে তুলে নিলে, তা সে অস্ত্র ব্যবহারের উদ্দেশ্য যতই মহান ও স্বপ্নময় হোক না কেন, রক্তের আঁশটে গন্ধের থেকে নিস্তার পাওয়া যায় না। এই কবিতায় কিন্তু যতক্ষণ পুষ্প 'গোপন' করে রাখে 'তার গন্ধ'। আর যে মুহূর্তে হাতে অস্ত্র তুলে নেবার সংকল্পে দৃঢ় হয় পাঠক, সেই মুহূর্তেই হঠাৎ আবার ফুলের গন্ধ নিয়ে ছুটে আসে হাওয়া:

দ্যাখো, আমি তোমার পাশে এসে দাঁড়িয়েছি।
তোমার অস্ত্র
আমার হাতে তুলে নেবার জন্যে নয়।
তোমার প্রতিজ্ঞা তোমাকেই রাখতে হবে,
এই কথাটা জানিয়ে দেবার জন্যে।
দ্যাখো, দিগন্ত থেকে
হঠাৎ আবার ফুলের গন্ধ নিয়ে ছুটে অসাছে
হাওয়া।

কোন্ সেই অস্ত্র যে অস্ত্র সুবাতাসকে আমন্ত্রণ জানায়? এই অস্ত্র নয় লুকোনো ছোরা বা দৃশ্যমান এ. কে. ফর্টি সেভেন। এই অস্ত্র আসলে ভেতরের সেই শক্তি যা মানুষকে ঘুরে দাঁড়াবার প্রেরণা দেয়। আর নীরেন্দ্রনাথ তাঁর পাঠককে সাহস দেন সেই অস্ত্রে শান দেওয়ার। কিন্তু শিক্ষিত মধ্যবিত্ত বাঙালির যে অংশটির জন্য এই কবিতা লেখা, যে অংশটিকে নীরেন্দ্রনাথ সাহস দেন, সেই অংশটি কি ভরসা পায় নীরেন্দ্রনাথের কবিতা থেকে? উলঙ্গ রাজা-কি হয়ে ওঠে তাদের সাহস সঞ্চয়ের আধার?

সতেরোতম বার উলঙ্গ রাজা মুদ্রিত হয়েছে এই তথ্য স্মরণে রাখলে বলতেই হয় যে নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী তাঁর লক্ষ্যপূরণে সফল। আসলে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত বাঙালির যে অংশটির সঙ্গে নীরেন্দ্রনাথ তাঁর কথোপকথন চালু রাখেন সেই বাঙালি নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীকে বিশ্বাস করে। এই বাঙালিকে নীরেন্দ্রনাথ বিপ্লবের মন্ত্রে দীক্ষিত করেন না, সময়ের সঙ্গে এই বাঙালির অসহায়তা বোঝেন, অপমানের সঙ্গী হন, স্বপ্নের খোঁজ রাখেন, রাখেন বলেই বিপদের মধ্যে এই বাঙালিকে তেমন তিনি ছুঁড়ে দিতে চান না, তেমনই যেন কানের পাশে মুখে রেখে ফিসফিস করে বলেন, 'মেনে নেবে, সবটুকু মেনে নেবে?' তাঁর কণ্ঠস্বরে থাকে না অনভিজ্ঞের রোমান্টিসিজম বা ধ্যানীর প্রজ্ঞা; থাকে স্নেহ, বন্ধুতা। নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী আসলে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত বাঙালির বন্ধু। সত্যি কথা বলতে কি অন্যের বন্ধু হয়ে ওঠার এক বিপুল ক্ষমতা কেবল কবি নয়, ব্যক্তি নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীরও করায়ত্ত। আশি পেরিয়ে যাওয়া নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর সঙ্গে, কবিতার নানা উৎসবে যোগ দিতে গিয়েই, বেশ কয়েকবার একত্রে থাকার অভিজ্ঞতা হয়েছে। কঠিন, পাথুরে পথ অতিক্রম করার সময় নীরেনদা অনেকবারই বলেছেন, 'একটু ধরো'। আমি হয়তো এগিয়ে গিয়ে তাঁর হাত ধরতে গেছি, কিন্তু আমি তাঁর হাত ধরবার আগেই, আমার কাঁঠের ওপর তিনি রেখেছেন তাঁর স্নেহের অঙ্গুলি। মনে হয়েছে অগ্রজ কেউ নন, যেন আমার এক বন্ধু-ই হাত রেখেছে আমার কাঁধে। তাঁর কবিতাতেও নীরেন্দ্রনাথ। 'এলাম', 'দেখলাম' এর মতো ক্রিয়াপদ ব্যবহার না করে তিনি লেখেন 'এলুম', 'গেলুম', লিখে ক্রিয়াপদের শরীর থেকে অহংকারের অলঙ্কার খুলে নিয়ে তাকে বিনয়ী করেন। 'বাপু শোনো' না লিখে, লেখেন 'বাপু হে', 'এসো' না লিখে লেখেন 'এসো হে'। আর যতই নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী এভাবে তাঁর ভাষাকে নমনীয় করে তোলেন, ততই পাঠকের কাছে তাঁর বিশ্বাসযোগ্যতা বৃদ্ধি পায়। ততই পাঠক, শিক্ষিত মধ্যবিত্ত বাঙালি পাঠক বিশ্বাস করে নিশান উড়িয়ে দিগন্তের দিকে মিলিয়ে যাওয়া কোনো বিস্ময় নন, নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী নন পালপিট থেকে বাণী বর্ষণ করা কোনো পাদ্রী, তিনি তাদের বন্ধু।

শিক্ষিত মধ্যবিত্ত বাঙালি পাঠকের বন্ধু হয়ে ওঠার যে ভূমিকা নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী বাংলা কবিতায় নিয়েছেন সেই অনন্য ভূমিকাটির শ্রেষ্ঠ রূপায়ণ ঘটেছে উলঙ্গ রাজা-য়। এই বই আজও তাই পাঠকের কাছে আগের মতোই আদর পায়। এ কথাও, বোধহয়, সাহস করে বলাই যায় যে রবীন্দ্র-পরবর্তী বাংলা কবিতায় নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী যেভাবে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত বাঙালি পাঠকের বন্ধু হয়ে উঠেছেড় ঠিক তেমনটি আর কেউ হননি। তাঁর নুজ যে সমস্ত কবিদের ওপর নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর প্রবাব আছে বলে মনে করা হয় তাঁদের কবিতা পাঠকের বন্ধ হয়ে ওঠার পরিবর্তে অনেক সময়ই পাঠককে আঘাত দেয়, ধাক্কা দেয়। প্রথম সাক্ষাৎ -এ এই ধাক্কা পরিমাণে কখনও কখনও এতটাই বেশি হয়েছে যে পরবর্তীতে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত বাঙালি পাঠকদের একটা অংশ এই কবিদের থেকে একটু দূরত্ব বজায় রাখাকেই দস্তুর বলে মনে করেছে, কিন্তু, নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর কবিতার কাছাকাছি পাঠক এসে দাঁড়ানো মাত্র নীরেন্দ্রনাথ বন্ধুর মতো পাঠকের পিঠে রেখে দেন তাঁর স্নেহময় হাত। পাঠক আর তাঁকে ছেড়ে যেতে পারে না। একথা ঠিক, নীরেন্দ্রনাথের মতোই শিক্ষিত মধ্যবিত্ত বাঙালি পাঠকের বন্ধু হয়ে উঠতে অনেকটাই পেরেছিলেন সুভাষ মুখোপাধ্যায়। কিন্তু, তাঁর জীবেনর মতোই সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কবিতাতেও এমন কিছু ছিল যা পাঠককে কেবল মুগ্ধই করেনি, বিস্মিতও করেছে। আর কে না জানে, বিস্ময়, কখনও কখনও, বিশ্বাসের বন্ধু নয়, প্রতিপক্ষ!